১১. গুপ্ত 'সুবর্ণযুগ'–বিতর্ক

গুপ্তযুগকে এক অসামান্য সৃজনশীল যুগ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্রুপদী রূপ এই যুগেই মূর্তহয়ে ওঠে। সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় এই অভূতপূর্ব উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ গুপ্তযুগকে প্রাচীন গ্রীসের পেরিক্লীয় যুগের সঙ্গে, কেউ আবার মধ্যযুগের ইংল্যান্ডের এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভারতীয় ইতিহাসচর্চাতেও দীর্ঘদিন গুপ্তযুগকে 'সুবর্ণযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অধুনা ভিন্ন চিন্তাধারার সূচনা হয়েছে যেখানে সুবর্ণযুগের ধারণাকে Myth বা অতিকথা বলা হয়েছে।

কুষাণোত্তর যুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে গুপ্তরাজগণ এক স্থিতিশীল রাজতন্ত্র ও সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। হুণ আক্রমণের হাত থেকে দেশের নিরাপত্তা বিধানের কর্তব্যও তাঁরা পালন করেন। কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের সামঞ্জস্য বিধানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্য সাধিত হয়। এই প্রেক্ষাপট উন্নতমানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উন্মেষকে প্রভাবিত করেছিল।

গুপ্তপূর্ব যুগ থেকেই সংস্কৃত ভাষার উৎকর্ষতা ও জনপ্রিয়তা অব্যাহত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অশ্বঘোষ ও চরক রচিত গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত। গুপ্তরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা অভাবনীয় উন্নতি করে। সমুদ্রগুপ্তের সময় রচিত হরিষেণ প্রশস্তি সুললিত সংস্কৃতের সাক্ষ্য বহন করে যা দীর্ঘকালের সাধনা ও চর্চার ফল। মহাভারতের কাহিনী ও তার ভাষ্য নতুন সংযোজনের ফলে গুপ্তযুগে পরিশীলিত হয়ে পূর্ণতা লাভ করে। পৌরাণিক সাহিত্যও এযুগে নতুন করে রচিত হয়। মহাভারত ও পুরাণের নতুন করে সম্পাদনার উদ্দেশ্য ভারতীয় জীবন থেকে কুষাণ, গ্রীক, পহ্লব প্রভৃতি বিদেশী প্রভাব দূর করা বলে অনেকে মনে করেন। বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সাহিত্য গুপ্তযুগে জনপ্রিয় ছিল। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি সারা ভারতে প্রসার লাভ করে। এ ক্ষেত্রে গুপ্তরাজদের অবদান অনস্বীকার্য।

গুপ্তযুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান কালিদাস। তাঁর রচিত শকুন্তলা, মেঘদূত, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহার প্রভৃতি মহাকাব্য ও মালবিকাগ্নিমিত্রম নাটক বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। মৃচ্ছকটিক নাটকের রচয়িতা শুদ্রক সম্ভবত এ যুগে জীবিত ছিলেন। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস ও বিষ্ণুশর্মার পঞ্চতন্ত্র এ যুগের অপর দুই মূল্যবান গ্রন্থ। যাজ্ঞবল্ক, নারদ, কাত্যায়ন ও বৃহস্পতি রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এ যুগেই সংকলিত। দন্ডিনের দশকুমারচরিত ও অমরসিংহের সংস্কৃত অভিধান অমরকোষ এ যুগেরই রচনা। বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু রচিত বৌদ্ধ দর্শন গ্রন্থ ও প্রমর্থ রচিত বসুবন্ধুর জীবনী এ যুগের অপর উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

গুপ্তযুগীয় স্থাপত্য শিল্পের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায় গুহামন্দির নির্মাণ কৌশলে। অজন্তা, ইলোরা ও বাঘগুহায় পাহাড় কেটে চৈত্য ও বিহার নির্মাণ গুপ্তযুগের অবদান। মন্দির স্থাপত্যে বিশেষ শৈলী লক্ষণীয়। এ যুগেই প্রথম পাথর ও ইঁটের তৈরি মন্দির নির্মাণ শুরু হয়। মন্দিরের চূড়া উঁচু করে নির্মিত হয়। মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় ও নাগররীতির প্রভাব লক্ষণীয়। গুপ্ত স্থাপত্য শিল্পের অপরূপ নিদর্শন তিগোয়ার বিষ্ণু মন্দির, ভূমারের শিবমন্দির, কুবীরের পার্বতী মন্দির, সাঁচী ও বুদ্ধগয়ার স্তূপ, দেওগড়ের দশাবতার মন্দির

ও ভিতরগাঁওয়ের মন্দির। সারনাথে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর নির্মিত মন্দির গুপ্ত স্থাপত্য শিল্পের চরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করে।

গুপ্তযুগের ভাস্কর্য বৈদেশিক প্রভাব মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ ভারতীয় শৈলীতে এক অসাধারণ উৎকর্ষতা লাভ করে। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধীয় ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে গুপ্তভাস্করগণ অনবদ্য শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। বুদ্ধগয়া ও সারনাথে প্রাপ্ত ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ, মথুরায় প্রাপ্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধ, সুলতানগঞ্জে প্রাপ্ত বুদ্ধের তাম্রমূর্তি বৌদ্ধভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দেওগড়ের দশাবতার মন্দিরের অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর মূর্তিতে রিলিফের কাজ উল্লেখযোগ্য। ভারতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ শিবমূর্তি গুপ্তযুগে নির্মিত হয়েছিল। পৌরাণিক আখ্যান অবলম্বনে রাম, কৃষ্ণ ও বিষ্ণুর মতো দেবতার মূর্তি এ যুগের ভাস্কর্যের উৎকর্ষতা প্রমাণ করে। প্রাণী, উদ্ভিদ ও মনুষ্যমূর্তিও ছিল ভাস্কর্যের উপজীব্য। স্নায়বিক উত্তেজনার স্থলে শান্ত সমাহিত রূপলাবণ্য এই মূর্তিগুলিতে উদ্ভাসিত।

গুপ্তযুগে চিত্রশিল্পেরও অপূর্ব বিকাশ ঘটে। মন্দিরের দেওয়ালগাত্রে আঁকা চিত্র চরম উৎকর্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। অজন্তা গুহাচিত্রের অধিকাংশই এ যুগের সৃষ্টি। এগুলি বাস্তবতায় পরিপূর্ণ ও সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর নর-নারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি। জাতক ও বুদ্ধের জীবনী অবলম্বনে বহু চিত্তাকর্ষক চিত্রও অজন্তায় অঙ্কিত হয়েছে। এছাড়া আছে মানুষের মুখের বিভিন্ন অভিব্যক্তি, পেলব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা, প্রস্ফুটিত পুষ্প, পশুর বিভিন্ন রূপ। মধ্যপ্রদেশের বাঘগুহাচিত্রাবলীতে অজন্তার শিল্পশৈলীর প্রবহমানতা লক্ষ্য করা যায়। এখানে বুদ্ধের চিত্রগুলি অনেক বেশি পার্থিব ও মানবিক। গুপ্ত চিত্রাবলীতে ধর্মীয় উপাদান প্রাধান্য পায়নি। কারণ বুদ্ধ ও জাতকের চিত্রকাহিনীগুলিতে রাজা, রাজদরবার, ঋষি, বন, নগরী ও গভীর অরণ্যের মতো বিভিন্ন ও বিচিত্র পটভূমিতে সাধারণ নরনারী উপস্থাপিত হয়েছে।

সাহিত্য ও শিল্প ছাড়াও এ যুগে জ্যোতিষ, গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রের মত জ্ঞান-বিজ্ঞানেও ভারতীয় মনীষার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। আর্যভট্ট ও বরাহমিহির এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। আর্যভট্ট রচিত সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির আবিষ্কর্তা তিনিই। বরাহমিহির রচিত বৃহৎ-সংহিতা ও পঞ্চসিদ্ধান্ত গ্রন্থদ্বয়ে গ্রীক ও রোমান জ্যোতিষশাস্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাণভট্ট রচিত অষ্টাঙ্গসংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা চিকিৎসা শাস্ত্রের দুটি বিখ্যাত গ্রন্থ। সুশ্রুত ছিলেন এ যুগের প্রথিতযশা চিকিৎসক,যদিও কেউ কেউ তাঁকে খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীর মানুষ বলে মনে করেন।

মৌর্যরাজ অশোকের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুটা গুরুত্ব হারালেও গুপ্তরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় তা পুনরায় প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এর পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও গুপ্তরাজাদের আনুকূল্য লাভ করে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। নাগার্জুন, বসুবন্ধু ও পরমার্থের মতো খ্যাতনামা বৌদ্ধ মনীষীদের আবির্ভাব এযুগেই হয়। নালন্দার মতো বৌদ্ধ মঠগুলি বৌদ্ধ শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। গুপ্তরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে জৈন ধর্মের প্রসার ঘটে। এ যুগে অনার্যদেবতা শিব জনপ্রিয়তা লাভ করে। বৈদিক ধর্মে শিব, কালী, কার্তিক ও লক্ষ্মীর মতো দেবদেবীকে অনার্য ও লৌকিক বলে ঘৃণার চোখে দেখা হত। গুপ্তযুগে তাঁরাই জনসাধারণের মনে স্থান করে নেন।

গুপ্তযুগের সার্বিক উন্নতির যে চিত্র সমসাময়িক তথ্য সূত্রে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই সুবর্ণযুগের ধারণা গড়ে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা ও রণবীর চক্রবর্তীর মতো আধুনিক ঐতিহাসিকগণ অবশ্য ভিন্ন মত উপস্থাপিত করেছেন। বলা হয়েছে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ

থেকে খ্রীঃ প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী শিল্প-বাণিজ্য ও নগরায়নের চরম বিকাশের যুগ। কিন্তু খ্রীঃ চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে দেখা দেয় শিল্প-বাণিজ্যে মন্দা, মুদ্রার অভাব, নগরবসতির ক্রমাবনতি, গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন প্রভৃতি পশ্চাদপদতার লক্ষণ।

আপাতদৃষ্টিতে গুপ্তযুগের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যে চিত্র ফুটে ওঠে তার বাস্তবতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। সমৃদ্ধির ফল লাভ করেছিল উচ্চকোটির মানুষ, আপামর জনতা এর সুফল লাভ করেনি। ব্রাহ্মণকে ভূমিদান বা অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে কৃষির প্রসার ঘটলেও কৃষক করভারে পীড়িত হচ্ছিল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকায় মুদ্রা-অর্থনীতির সঙ্কোচন ঘটে, বিশেষ করে বাকাটক অঞ্চলে। কৃষি অর্থনীতি প্রাধান্য পাওয়ায় কারিগরী শিল্প ও ব্যবসার ওপর আঘাত আসে। অর্থনীতি গ্রামকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এই লক্ষণগুলির মধ্যে সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের ছাপ নেই। সেইজন্য সুবর্ণযুগের ধারণা কষ্টকল্পিতই থেকে যায়। কারণ সুবর্ণযুগের আবশ্যিক লক্ষণ হল জনসাধারণের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মানোন্নয়ন।

গুপ্তযুগের সাহিত্য ও শিল্প অভিজাতশ্রেণীর বিনোদনের জন্য সৃষ্টি। নাটকের বিষয়বস্তু রাজন্যবর্গের যুদ্ধযাত্রা ও আমোদপ্রমোদ। সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃত অবহেলিত থাকে, উচ্চবর্ণের মানুষ সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করে। ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের বারমাস্যা স্থান পায়নি। গুপ্তযুগেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যের ফলে বর্ণভেদের কঠোরতা বৃদ্ধি পায়। অন্ত্যজ শ্রেণীর অপবিত্রতা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথার প্রচলনের ফলে নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায়। দাসপ্রথা প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা পায়।

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ ঝা দেখিয়েছেন, প্রধানত নিজেদের প্রচারিত লেখমালাতেই শুধু গুপ্তরাজদের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এর মধ্যে হরিষেণ প্রশস্তিই বিশালতম। অন্যান্য সূত্রে সেরকম নয়। পতনের পর গুপ্তরাজদের হয়ত কেউ মনে রাখত না কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে তাঁদের লেখমালার পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী লেখকগণ ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গুপ্তশাসনকেই গৌরবান্বিত করে তোলেন। সেইজন্যই মন্তব্য করা হয়েছে, গুপ্তরাজগণ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটাননি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদই গুপ্তরাজদের উন্মেষ ঘটায়।

তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে 'সুবর্ণযুগ' অভিধার মধ্যে অতিরঞ্জন থাকলেও গুপ্তযুগে সাহিত্য, দর্শন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও ধর্মচিন্তার মধ্যে যে অভূতপূর্ব সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার তুলনা কম। বস্তুত সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মানদণ্ডে বিচার করলে কোনো সভ্যতা বা যুগকেই 'সুবর্ণ' আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ আজ পর্যন্ত কোনো সভ্যতা বা সমাজব্যবস্থাই উচ্চ ও নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে পারেনি। ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা হ্রাস করেছে মাত্র।